কিশোর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস

সোনার তরীর দুই যাত্রী

রেবন্ত গোস্বামী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বিজন কর্মকার

—কৈফিয়ত—

ইতিপূর্বে কল্পবিজ্ঞান নিয়ে কিছু গল্প লিখলেও তা নিয়ে উপন্যাস লেখার দুঃসাহস আগে কখনও হয়নি। তারপর একদিন ভাবলাম চেষ্টা করে দেখিই-না। বিষয় সেই গতানুগতিক গ্রহান্তর অভিযান হলেও একটু অন্য চিন্তা মাথায় এল। শেষে লিখে ফেললাম একটা। সেটাও প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। একজন বিশিষ্ট প্রয়াত কল্পবিজ্ঞান লেখককে সেটা পড়তে দেওয়া হল। ফোন করতে তিনি বললেন, মন্দ হয়নি। প্রকাশ করা যেতে পারে। তখন পাঠিয়ে দিলাম একজন পত্রিকা-সম্পাদককে। তিনি উত্তর দিলেন, বর্তমান ধারাবাহিক লেখাটি শেষ হলেই ওটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রকাশমান ধারাবাহিক শেষ হতে অন্য একটি শুরু হল। তারপর বছরের পর বছর কেটে যায়, কয়েকটি চিঠির উত্তর না পাওয়াতে বুঝলাম লেখাটি নির্ঘাত হারিয়েছে। নিজের কাছে কোনও জেরক্স কপি আমি রাখতাম না। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এরকম হলে খসড়া থেকে আবার নতুন করইয়া লিখতাম। তাতে প্রথমবারের লেখা থেকে অনেক পার্থক্য হত। হয়তো গল্পের নামও। বছর ঘুরে গেলেও পত্রিকা দপ্তর থেকে কোনও চিঠি বা চিঠির উত্তর (তখন এটাই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম) না পেলে নতুন লেখাটা অন্য কোথাও পাঠাতাম। সেখানে ছাপা হওয়ার পরে অনেক সময় হঠাৎ দু-এক বছর পরে আগের লেখাটাও প্রকাশিত হয়ে যেত। তখন সেটা আমার কাছে একটা

অস্বস্তিকর ব্যাপার হত। উপন্যাসটির বেলায় অত ধৈর্য ছিল না। ভুলে গেলাম লেখাটির কথা।

গত দু-হাজার বিশের বিষময় বছরে লেখাটির কথা একজনের কাছে কোনও মুহূর্তে একবার ব্যক্ত করে ফেলেছিলাম। আর যাই কোথায়! সে বলে উঠল, 'লিখুন-না আবার উপন্যাসটা।' হাস্যকর ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। যে সুর হারিয়ে যায়, সেই হারানো সুর কি আর ফিরে পাওয়া যায়! তাও প্রায় দু-দশক পরে? তার ওপরে চারদিকের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনেক জরুরি কাজকেও থামিয়ে দেওয়াতে মানসিকভাবেও কিছুটা বিপর্যস্ত। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে শুনতাম, 'কোনও কিছু তো করার উপায় নেই, তাই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবুন।' তার এই বারংবার অনুরোধ আমাকে দুর্বল করে দিল। একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। পুরোনো লেখাটির কথা ভাবতে গিয়ে দেখি তার নাম, শুরু ও শেষ এবং চরিত্র দুটির নাম ছাড়া আর সব কিছুই বিস্মৃতির সাগরে তলিয়ে গিয়েছে। শুরু করলাম লিখতে। চরিত্র দুটির প্রকৃতিও একই রকম রাখার চেষ্টা করলাম। তবে সুভদ্র আগে ছিল কবি। যা কিছু দেখে, তাতেই তার বিস্ময় আর আনন্দ। বিস্ময়ে তার প্রাণ জেগে উঠত সব কিছুতেই, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সে বয়ে চলতে দেখত আনন্দধারা। আর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করত তার তাৎক্ষণিক রচিত কবিতা। এই দু-দশককালে তার সেই কবি প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে বয়োবৃদ্ধির কারণেই হয়তো কিছুটা দার্শনিক হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন ঘটনাবলি দিয়ে লিখেই ফেললাম "সোনার তরীর দুই যাত্রী" নামের উপন্যাসটিকে।

যে আমাকে বারবার বলে আমাকে দিয়ে উপন্যাসটি লিখিয়ে নেওয়ার

মতো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল, সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, সেই সুলেখক এবং আদর্শ সম্পাদক শ্রীমান সুদীপ দেব— যাকে আমি এই বইটি উৎসর্গ করেছি।

অলমিতি—

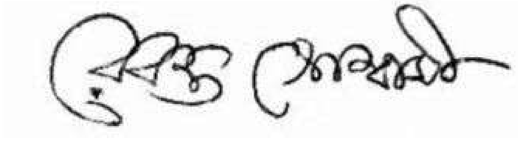

২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

—প্রাক্‌কথন—

সাত্যকি সোম ও ওরা তিনজন

অবশেষে সেই দিন প্রায় এসে গেল। মে মাসের আট তারিখেই সাত্যকি সোমের গবেষণাগারে তৈরি মহাকাশযান 'সোনার তরী' প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ থেকে অজ্ঞাত গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটে যাবে। ড. সোম তাঁর সোনার তরীর দুজন প্রশিক্ষিত তরুণ যাত্রী প্রজ্ঞান ও সুভদ্রকে তাঁর ঘরে ডেকে শেষ কদিনের তালিম দিচ্ছিলেন। এমন সময় ঝড়ের মতন গৌতম ব্রহ্ম ঘরে প্রবেশ করল।

ড. সোমের দিকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে চেয়ে বলল, 'বিজ্ঞানী, একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। রাখা যাবে?'

ড. সোম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'কী, গৌতম?'

গৌতম বলল, 'সোনার তরীর যাত্রাটা ছয় দিন পিছিয়ে চোদ্দো তারিখে করা যায় না?'

সাত্যকি সোম কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন গৌতম? তাতে কী হবে?'

গৌতম এবার কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'আসলে ওইদিন অক্ষয় তৃতীয়া। কাল কালীঘাটের কুলদা ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, ওইদিন কোনও শুভকাজ করলে তার অক্ষয় ফললাভ হয়। সোনার তরীর যাত্রাও নির্বিঘ্নে হবে।'

সাত্যকি সোম হো হো করে হেসে বললেন, 'তোমার জ্যোতিষী যখন কষ্ট করে এত ক্যালকুলেশন করেছেন, তবে তো তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। ঠিক আছে, এই সময়টা ওই দ্বীপে ভালোই আবহাওয়া। সমস্ত বিজ্ঞানী টেকনিশিয়ানদের জানিয়ে দেব। ওই তারিখেই হবে।'

গৌতম খুশি হয়ে বলল, 'তা ছাড়া আজ থেকে বাইশ বছর আগে এদের দুজনকে শিশু অবস্থায় যেদিন আমরা পেয়েছিলাম, সেদিনকে এদের জন্মতিথি ধরলে সেই তিথিতে নাকি এদের বৃহস্পতি তুঙ্গে।'

ড. সোম বললেন, 'তবে তো সোনায় সোহাগা। ছুটলে তরী থামায় কে?'

এবার গৌতম আস্তে মিনতির সুরে বলল, 'আমাকে কি আপনি নিয়ে যাবেন? আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য একজন চাকরও তো লাগবে।'

সাত্যকি সোম বললেন, 'সে তুমি যেতেই পারো। তবে তুমি তো সেখানে কনট্রোল রুমে ঢুকতে পারবে না। ওখানে আমাদের ঘরে একটা টেলিভিশন থাকবে, সেখান থেকেই যাত্রা দেখবে।'

হঠাৎ এককোণ থেকে ঠোঁটকাটা রোবট নরোত্তম বলে উঠল, 'কখনোই নেবেন না স্যার। ওখানে কেউ হেঁচে ফেললে রকেট ছোড়া বন্ধ করে দিতে বলবে।'

নরোত্তম যে চালু অবস্থায় আছে ড. সোম খেয়াল করেননি। তাড়াতাড়ি উঠে তার সুইচ অফ করে দিলেন। তারপর প্রজ্ঞান ও সুভদ্রকে তাদের ঘরে যেতে বললেন।

নিজেদের ঘরে এসেই প্রজ্ঞান রাগে ফুঁসে উঠে বলল, 'সাত্যকি সোমের মতো একজন বিজ্ঞানী এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাজে লোকটাকে

এত প্রশ্রয় দেন কেন, আজও বুঝতে পারি না ভদু। নরোত্তম পর্যন্ত ওকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আর আমাদের বৃহস্পতি তুঙ্গে মানে কী? সেদিন বৃহস্পতি পৃথিবীর থেকে দূরে চলে যাবে? তাও শুধু আমাদের জন্য? যত সব অশিক্ষিত, সমাজের আবর্জনা!'

বন্ধুকে থামাতে সুভদ্র বলল, 'আঃ গ্যানা! তাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। তা যদি হত তবে গুরুপিতা নিজেই আপত্তি করতেন। তা ছাড়া গৌতমদার মন কী ভালো সেটা ভাবিস। আমাদের কত শুভচিন্তা করেন। আমার সঙ্গে এসে কত গল্প করেন।'

প্রজ্ঞান ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'রাখ ওসব আজগুবি গল্প। ওসব শুনিস বলেই ড. সোমের কাছে তোর যত প্রশংসা আর আমার নিন্দে। আমি স্পষ্ট শুনেছি একদিন বিজ্ঞানীর কাছে বলছিল, আপনার দেওয়া সুভদ্র নামটা একেবারে ঠিক। কিন্তু অন্যটার নাম অভদ্র দিলেই ঠিক হত।'

ওদিকে ড. সোম তাঁর ঘরের ড্রওয়ার থেকে একটা যন্ত্র বের করে তাঁর ফোনে লাগিয়ে এই তারিখের পরিবর্তনটা বাংলায় কাকে বললেন। গৌতম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে বললেন?'

সাত্যকি সোম তাঁর ফোন থেকে যন্ত্রটা খুলে গৌতমকে দেখিয়ে বললেন, 'এই জি-বি প্রোজেক্টে যত বিজ্ঞানী জড়িত সবাইকে তোমার অক্ষয় তৃতীয়ার তারিখটা বলা হয়ে গেল। এই যন্ত্র বাংলাভাষাকে পৃথিবীর প্রধান ষাটটা ভাষায় অনুবাদ করতে পারে। প্রত্যেক বিজ্ঞানী তাঁর মাতৃভাষায় আমার কথা শুনতে পারবেন। আবার তাঁরা কিছু বললে এই যন্ত্র সেটা বাংলায় অনুবাদ করে দেয়। কেমন মজা বলো তো!'

গৌতম এবার কথা ঘুরিয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে এই যাত্রাপথে

সুভদ্র আর প্রজ্ঞানের মধ্যে কোনও ঝামেলা না হয়। কী করে যে ওদের বন্ধুত্ব হল জানি না।'

সাত্যকি হেসে বললেন, 'জানো তো, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে!'

গৌতম তবুও বলে চলে, 'সুভদ্রর যেমন পুরোটাই হার্ট বা হৃদয়, প্রজ্ঞানের সবটাই ব্রেন। ওর শরীরে বোধ হয় হার্ট নেই। তা-ই না?'

ড. সোম বললেন, 'গৌতম, মানুষের হার্ট একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না। সেইজন্য বাংলায় হার্টকে হৃদপিণ্ড বলে। হৃদরোগ বলে, হৃদয়রোগ না। এইসব আবেগ ভালোবাসা রাগ অভিমান— সবই মস্তিষ্কের লিমবিক সিস্টেমের কাজ। অর্থাৎ প্রজ্ঞান আর সুভদ্রর সব ব্যবহারই মস্তিষ্ক করছে। হৃদপিণ্ড নয়। আর তা ছাড়া তোমার ভয় অমূলক। সোনার তরী প্রায় আলোর গতিতে যাবে। তাই যাত্রাপথে সুভদ্র ও প্রজ্ঞানের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। এই ছায়াপথে উপযুক্ত গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করলেই তখন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় তারা তাদের স্বরূপ ফিরে পাবে। তাই লাঠালাঠির সম্ভাবনা নেই।' বলে হাসলেন।

এবার গৌতম অন্য প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বিজ্ঞানী, ওদের জন্য আপনার মন-কেমন করবে না? বাইশ বছর ধরে মানুষ করেছেন।'

সাত্যকি সোম বললেন, 'না গৌতম, ওরা হয়তো দু-তিন হাজার কি তারও বেশি বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তখন তুমি আমি তো কোন ছাড়, কত কী হয়ে যাবে এই পৃথিবীতে। জানি না, আদৌ পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে কি না।'

গৌতম দুঃখী মুখে বলল, 'আপনি-আমিই যখন থাকব না, তখন